তারিখ ... 11 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষার্থীরা : মাশুল দিচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঝরে পড়ার আশংকা আছে। শিক্ষাবিদদের মতে, নীতিনির্ধারকদের ভুলেরই শিকার হয়েছে এ বারের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩ লাখ ফেল করেছে। জিপিএ-৫-প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ২৩ হাজার ৬৮ জন। এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে হঠাৎ চালু করা আইসিটিকে। এর সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে বাংলা ও ইংরেজি। এবার এই দুই বিষয়ে ফেলের সংখ্যাও অনেক।

জানা গেছে, ১০০ নম্বরের আইসিটি বিষয়টি দু'বছর আগে হঠাৎ করেই আবশ্যিক হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। এর আগে বিষয়টি 'কম্পিউটার শিক্ষা' নামে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়েছে। তখন ৬ মাসের ডিপ্লোমাধারীরা এ বিষয়ে শিক্ষক হয়েছেন। ওই সময় বিষয়টি ঐচ্ছিক হওয়ায় সব কলেজে শিক্ষকও ছিল না। ২০১৩ সাল থেকে আইসিটিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নতুন শিক্ষক নেয়া হয়নি। সরকারের জনবল কাঠামো এবং এমপিও নীতিমালায় বাড়তি শিক্ষক নিয়োগে বাধার কারণে কলেজগুলো এ বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারছে না। ফলে শিক্ষক ছাড়া বা কম যোগ্যতার ও অদক্ষদের দিয়েই ক্লাস নিতে হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা এ ধরনের শিক্ষকের কাছ থেকে তেমন কিছুই শিখতে পারেনি। যে কারণে উত্তরপত্রে যথাযথভাবে লিখতে পারেনি। এতে আইসিটিতে ফেল করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ বলেন, এবার খারাপ ফলের পেছনে আমরা যে কারণগুলো চিহ্নিত করেছি এর মধ্যে অন্যতম আইসিটি বিষয়। আমাদের ৯৯ হাজার ৯৬৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ হাজারই ফেল করেছে আইসিটিতে। তিনি বলেন, নতুন পাঠ্যবইয়ের ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না দেয়া আরেকটি কারণ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সরকারি কলেজের এক অধ্যক্ষ বলেন, অনেক শিক্ষক সৃজনশীল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছাড়াই ক্লাসে পাঠদান করছেন। অপরদিকে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই না বুঝেই শ্রেণীকক্ষে বসে মাথা নাড়ছে। বাড়ি ফিরে নোট বইয়ের মতো গাইড নাড়াচাড়া করে সময় পার করছে। এরা পরীক্ষার হলে যথাযথভাবে প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারছে না। অন্যদিকে অনেক শিক্ষক উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন। এসবের বিরূপ প্রভাব পড়ছে পাবলিক পরীক্ষার ফলে।

গত ৩০ জুন প্রকাশিত এসএসসির ফলেও বিপর্যয় ঘটে। ওই পরীক্ষায় পাসের হার আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৬ ভাগ কম ছিল। এসএসসির ফল বিপর্যয়ের জন্য নতুন চালু করা সৃজনশীল গণিতের প্রভাবকে তখন দায়ী করা হয়েছিল। প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছাড়াই গণিতের মতো বিষয়কে সৃজনশীল করা হয়েছিল। শিক্ষকরা কি পড়াবেন শিক্ষার্থীরা কি পড়বে বুঝে ওঠার আগেই সময় শেষ হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীকে বসতে হয়েছে পরীক্ষায়। এতেই ফল বিপর্যয় ঘটেছে।

ছয় বছর আগে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও স্কুল-কলেজের সব শিক্ষককে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নামমাত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশিক্ষণ পাওয়া রাজধানীর একাধিক স্কুল ও কলেজ শিক্ষক জানিয়েছেন, ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ তারা পেয়েছেন। কিন্তু ৩ দিনের মধ্যে প্রথম দিন উদ্বোধন আর অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতায় শেষ হয়। শেষ দিনও সমাপনীসহ অন্য কাজে সময় পার হয়েছে। মাঝের একদিন হয়েছে প্রশিক্ষণ। এসব শিক্ষক জানান, এ অবস্থায় কম যোগ্যতার শিক্ষকরা এ প্রশিক্ষণ পেয়ে কতটা কাজে লাগাতে পারছেন তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। এ বিষয়ে এ সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারি প্রকল্প সেসিপের (মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন কর্মসূচি) যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক রতন রায় বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রশিক্ষণ ৩ দিনের বেশি দেয়া হয় না। তাই যারা বোঝার এই ক'দিনেই বুঝেছেন। তিনি স্বীকার করে বলেন, আসলে আমাদের বেশিরভাগ শিক্ষকই অযোগ্য। এমন অনেক শিক্ষক আছেন তারা প্রশিক্ষণের ভাষা পর্যন্ত বোঝেন না। তাই সমস্যা প্রশিক্ষণের নয়, শিক্ষকেরই।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিকও মনে করেন, সৃজনশীল পদ্ধতি এখনও শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। তার মতে, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে সফল হতে হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী ও চিন্তাশক্তি এবং সমস্যা সমাধানের জ্ঞান থাকতে হবে। সেই সঙ্গে ক্লাসে শিক্ষকের আন্তরিকতাপূর্ণ ও সঠিক পাঠদান লাগবে। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থী পাঠ্যবই নির্বিচারভাবে পড়ে না। তারা গাইডবই আর টেস্ট পেপারনির্ভর হয়ে পড়েছে। পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন হলে ফল এভাবে খারাপ হতো না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, এবার খারাপ ফল হওয়ার পেছনে বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেন, ফাঁসরোধে এবার এক বোর্ডের প্রশ্ন অন্য বোর্ডকে দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিজ নিজ বোর্ডের আগের বছরের প্রশ্ন দেখে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। তাই তারা যে ধারায় অভ্যস্ত হয়েছে এবার তারা সেটা পায়নি। অন্য বোর্ডের প্রশ্নে তাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। প্রশ্নের নতুন ধারার কারণে তারা খারাপ করেছে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন জানান, উচ্চ মাধ্যমিকের গেল বছরের পরীক্ষা সারা দেশে একই প্রশ্নপত্রে হয়েছে। কিন্তু এবারই প্রথম প্রত্যেক শিক্ষা বোর্ড আলাদা ৪ সেট করে প্রশ্নপত্র তৈরি করে। এতে ৩২ সেট প্রশ্ন পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সমস্যা হল, ঢাকা কলেজের একজন শিক্ষক যে মানের প্রশ্ন তৈরি করবেন, মফস্বলের একটি কলেজের শিক্ষকের প্রশ্নের মান নিশ্চয়ই এক হবে না। এ ক্ষেত্রে সহজ আর কঠিন প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে কঠিন প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অনেকে খারাপ করেছে। তার কথার সমর্থন পাওয়া যায় ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দের মন্তব্যে। তিনি বলেন, এ কারণে দেখাযেন সব বোর্ডে একই বিষয়ে খারাপ করেনি, যা অন্যান্য বছর হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন বোর্ডের বাংলা, ইংরেজি, পদার্থ, রসায়ন, হিসাববিজ্ঞান ও পৌরনীতির ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ ছয়টি বিষয়ের মধ্যে এবার ঢাকা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি খারাপ করেছে ইংরেজিতে। এ বিষয়ে এবার পাসের হার ৭৯ দশমিক ১০ ভাগ। অর্থাৎ প্রায় ২১ শতাংশ শিক্ষার্থীই এ বিষয়ে ফেল করেছে। এ বোর্ডে হিসাববিজ্ঞানেও ফেলের হার প্রায় ১১ ভাগ। এভাবে রাজশাহী বোর্ডে ইংরেজিতে প্রায় ১২ ভাগ, পদার্থে ২৩ ভাগ, রসায়নে ১২ ভাগ ফেল করেছে। ৮টি সাধারণ বোর্ডের মধ্যে যশোর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বোর্ডের ফল ভালো হয়নি। এই তিন বোর্ডের মধ্যে যশোরকে ডুবিয়েছে ইংরেজি ও পদার্থবিজ্ঞান। ইংরেজিতে প্রায় ৪৯ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। পদার্থে ফেল করেছে প্রায় ২৫ ভাগ। চট্টগ্রাম বোর্ডে ইংরেজির ফল গতবছরের চেয়ে ভালো। তবে পদার্থ, রসায়ন আর হিসাববিজ্ঞান ডুবিয়েছে এ বোর্ডকে। পদার্থ ও হিসাববিজ্ঞানে ১৮ ভাগ করে শিক্ষার্থী ফেল করেছে।

এ বিষয়ে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, গত দু'বছরে আমার ছাত্রদের মধ্যে ১২০ জন শিক্ষক ভালো সুযোগ পেয়ে সৌদি আরব, মালয়েশিয়াসহ অন্য দেশে চলে গেছে। তাদের উপযুক্ত রিপ্লেস (পুনঃশিক্ষক নিয়োগ) করা হয়নি। এভাবে সারা দেশেই ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আর বাংলায় শিক্ষার্থীরা ফেল করবে না কেন। অনেক শিক্ষার্থী কথা বলে এফএম রেডিওর ভাষায়। ৪টি শব্দ বললে একটি থাকে ইংরেজি। ওই শব্দের বাংলা অর্থও অনেকে জানে না।

বিভিন্ন বিষয়ে এবার তুলনামূলক খারাপ ফল সম্পর্কে ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলেন, বোর্ডে আলাদা প্রশ্ন করার বিষয়টি প্রবর্তন করা হলেও প্রশ্নকর্তা বা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। ফলে একদিকে সমমানের প্রশ্ন তৈরি হয়নি। কেউ কঠিন আবার কেউ সহজ প্রশ্ন করেছে। তবে সমমানের প্রশ্ন যাতে হয়, সেজন্য এখন আমরা কর্মশালা আয়োজনের চিন্তা করছি।